বাঙালীর জীবিকা

রাজশেখর বসু

এই সম্মেলনের যাঁরা আয়োজন করেছেন তাঁদের ইচ্ছাক্রমে বাঙালীর জীবিকা সম্বন্ধে কিছু বলছি।

আমাদের বর্তমান অবস্থার উদ্‌ভব হঠাৎ হয়নি, কালক্রমে ধীরে ধীরে হয়েছে। তা বুঝতে হ'লে পূর্বের অবস্থারও কিঞ্চিৎ আলোচনা দরকার। আমি প্রধানত মধ্যবিত্ত ভদ্রসমাজের কথা বলছি। পঞ্চাশ ষাট বৎসর আগে এই শ্রেণীর জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার অনুপাতে এখনকার চেয়ে অনেক কম ছিল। ভদ্রের উৎপত্তি মুখ্যত বর্ণগত বা জন্মগত হ'লেও তার কতকগুলি লক্ষণ বহুকাল থেকে আছে, যেমন বিশেষ রকম শিক্ষা, বৃত্তি আর চালচলন। কালক্রমে এই গৌণ লক্ষণগুলিই মুখ্য হয়ে উঠল, ভদ্রতা জন্মগত না হয়ে কর্মগত বা শিক্ষাগত হ'ল, তার ফলে ভদ্রের সংখ্যা অবাধে বাড়তে লাগল। এখন ভদ্র বললে gentleman বোঝায়, উচ্চবর্ণ নয়।

আমাদের ছেলেবেলায় মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের বিদ্যাচিন্তা ও অর্থচিন্তা ঠিক এখনকার মত ছিল না। তখন কলেজী শিক্ষায় বি. এস-সি, এম. এস-সি, শ্রেণীর সৃষ্টি হয়নি, ছাত্ররা বি.এ ক্লাসে রুচি অনুসারে এ-কোর্স বা বি-কোর্স নিত। বিজ্ঞান শিক্ষার উপর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না, ছাত্ররা সাহিত্য-ইতিহাস দর্শনাদিই বেশী পছন্দ করত, বিজ্ঞানের ছাত্র কম হ'ত। সেকালের অনেক বিজ্ঞলোককে বলতে শুনেছি—সায়েন্স তো ছেলেখেলা, বাজিকররা যা দেখায় সেইরকম; ইংরাজী সাহিত্যই আসল জিনিস, তার উপরেও যদি কিছু চাও তো ফিলসফি হিষ্টরি আর সংস্কৃত পড়। এই ধারণার কারণও ছিল। বি.এ পাশ করে একটু ইংরেজী বলতে আর লিখতে পারলে এবং

কিঞ্চিৎ মুরব্বীর জোর থাকলেই ডেপুটিগিরি বা অন্য ভাল চাকরি মিলত। রোজগারের অর্থ ছিল গভর্ণমেণ্ট বা ইংরেজ বণিকের অফিসে চাকরি। এখনও ভদ্রগৃহস্থের ভাষায় রোজগার বললে সাধারণত চাকরিই বোঝায়। অবশ্য সেকালেও অনেকে ওকালতি ডাক্তারি প্রভৃতি স্বাধীন বৃত্তি নিতেন এবং অনেকে পুরুষানুক্রমে জমিদারী সেরেস্তা, যাজন, অধ্যাপনা, অথবা বৈদ্যের কর্মে নিযুক্ত থাকতেন। বাণিজ্য প্রধানত নিম্নতর শ্রেণীতেই আবদ্ধ ছিল। বণিক জাতি ধনী হ'লেও ভদ্রসমাজে কিঞ্চিৎ অবজ্ঞাত হয়ে থাকতেন, তাঁরা কোন্ বিদ্যার বলে অর্থ উপার্জন করছেন ভদ্রলোকরা তার সন্ধান নিতেন না। বণিকের জাতিগত নিম্নতা এবং অপেক্ষাকৃত অমার্জিত আচারব্যবহারের সঙ্গে তাঁদের অর্থকরী বিদ্যাও ভদ্রসমাজে উপেক্ষিত হ'ত।

বাঙালী ভদ্রসন্তান ইংরেজী শিক্ষায় অগ্রণী ছিলেন, সেজন্য সেকালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে তাঁদের সাদর নিমন্ত্রণ আসত। তাঁদের প্রতিপত্তি আর চালচলন দেখে অপর শ্রেণীর লোকেও পৈতৃক ব্যবসা ছেড়ে ভদ্রের পদাণুসরণ করতে লাগলেন, তার ফলে ভদ্রের সংখ্যা দ্রুতবেগে বাড়তে লাগল। ক্রমশ অন্য প্রদেশবাসীও শিক্ষিত হয়ে চাকরি, ওকালতি, ডাক্তারি প্রভৃতি বৃত্তি দখল করতে লাগলেন। এইরূপে ঘরে-বাইরে প্রতিযোগিতার ফলে বাঙালী ভদ্রসন্তানের অভ্যস্ত জীবিকা দুর্লভ হয়ে উঠল। অবশেষে একদিন তাঁরা হঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে ব্যবসা ভিন্ন আর অন্য পন্থা নেই। বাঙালী বণিক সম্প্রদায়ও দেখলেন যে ভদ্র হবার মোহে তাঁরা পুরুষানুক্রমিক ব্যবসাবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছেন, তাঁদের আসন অন্য প্রদেশবাসীরা দখল করেছে।

কয়েকজন ভদ্রসন্তান ছোটখাটো ব্যবসায়ে মন দিলেন; কিন্তু যে ব্যবসা বহুকাল থেকে নিম্নশ্রেণীর সঙ্গে জড়িত তা ভদ্রের অযোগ্য। অতএব ছুতোর, কামার, ধোপা, দরজির কাজ বা মুদিগিরি চলবে না। কিন্তু যে কাজ নূতন অথবা ইংরেজি নামে পরিচিত, তা করলে ভদ্রতার হানি

হয় না। অতএব ঘড়ি, বাইসাইকেল, গ্রামোফোন মেরামত, লণ্ড্রি, টি-শপ, রেস্তোরাঁ, ষ্টেশনারি শপ প্রভৃতি ভদ্রের উপযুক্ত। কিন্তু এসব বৃত্তিতে বেশী রোজগার হয় না।

বাঙালী ইতরভদ্রের অকর্মণ্যতার সুযোগে এই দেশ পরদেশীতে ভ'রে গেল। তাদের একদল এদেশের মুটে, মজুর, ধোপা, কামার, কুমোর, মাঝী, মিস্ত্রীকে স্থানচ্যুত করলে, আর একদল বাঙালী বণিকের হাত থেকে ছোট বড় ব্যবসায় কেড়ে নিলে এবং নূতন নূতন ব্যবসায়ের পত্তন করলে। শিক্ষিত বাঙালী লোলুপ হয়ে এই শেষোক্ত দলের কীর্তি দেখতে লাগল, কিন্তু তাদের পদ্ধতিতে দন্তস্ফুট করতে পারল না। এই আগন্তুকরা ইংরেজী বিদ্যা জানে না, আধুনিক বুক-কিপিং বোঝে না, তথাপি বাণিজ্যলক্ষ্মী এদের ঘরেই বাসা বাঁধলেন। এরা নির্বিচারে দেশী বিলাতী দরকারী অদরকারী উপকারী অপকারী সকল পণ্যের উপরেই ব্যবসার জাল ফেলেছে। উৎপাদকের ভাণ্ডার থেকে ভোক্তার গৃহ পর্য্যন্ত নানা পথের প্রত্যেক ঘাটিতে দাঁড়িয়ে এরা পণ্য থেকে লাভ আদায় করছে।

শিক্ষিত বাঙালী ঈর্ষা অজ্ঞতা আর অক্ষমতার জন্য এই সব পরদেশীর কার্যপ্রণালী অবজ্ঞার চক্ষে দেখতে লাগলেন। এরা অশিক্ষিত, অমার্জিত, ধনী হ'লেও মানসিক সম্পদে নিঃস্ব। এরা এদেশে এসে বহু কষ্ট স্বীকার করে হীনভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে এবং কৃপণের মত অর্থ সঞ্চয় ক'রে ক্রমশ ধনী হয়। বাঙালী ভদ্রসন্তান তা পারে না, তার ভব্যতার একটা সীমা আছে। অতএব ইওরোপীয় ব্যবসায়ীর আদর্শে চলতে হবে, বিজ্ঞান শিখে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পণ্য উৎপাদন করতে হবে।

বাঙালী ভদ্রসন্তান দলে দলে বিজ্ঞান শিক্ষায় মন দিলেন। সকলের না থাকুক, অনেকের মনে এই আশা ছিল যে কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স শিখলে আধুনিক পদ্ধতিতে নানারকম পণ্য তৈরী করা যেতে পারবে। কিন্তু

দেখা গেল যে বিজ্ঞান শিখলেই শিল্প শেখা যায় না, technical education চাই, যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিল্প সামগ্রী উৎপন্ন হয় তার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় চাই। কিন্তু কার্যত দেখা গেল যে technical ক্লাসে অথবা ফলিত বিজ্ঞানের ক্লাসে শিক্ষা পেলেও শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা সুসাধ্য হয় না।

কেন হয় না তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। বিজ্ঞানে খাদ্য সম্বন্ধে অনেক কথা আছে কিন্তু খাদ্য তৈরি বা রান্নার বিস্তারিত উপদেশ নেই। বিজ্ঞান পড়লে রান্না শেখা যায় না, তার জন্য অভিজ্ঞ লোকের কাছে হাতা-খুন্তির প্রয়োগ শিখতে হয়। এরই নাম technical education। এই শিক্ষা পেলে পাচকের চাকরি মিলতে পারে এবং অবস্থা অনুসারে প্রচলিত রীতির একটু আধটু বদল করে মনিবকে খুশীও করা যায়। আয় ব্যয়ের কথা ভাবতে হয় না, তা মনিবের লক্ষ্য। কিন্তু যদি কোনও উচ্চাভিলাষী লোক রন্ধনবিদ্যাকে একটা বড় কারবারে লাগাতে চায়, অর্থাৎ হোটেল খুলে রোজ দু-চার শ লোককে খাওয়াতে চায়, তবে কেবল রন্ধনবিদ্যায় কুলোবে না, অনেক নূতন সমস্যার সমাধান করতে হবে। মূলধন চাই, উপযুক্ত জায়গায় বাড়ি চাই, উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত মূল্যে কাঁচা মাল খরিদ চাই, লোক খাটাবার ক্ষমতা চাই, যথাকালে বহু লোককে খাওয়াবার ব্যবস্থা চাই, হিসাব রাখা, টাকা আদায়, আয়ব্যয় খতিয়ে লাভ-লোকসান নির্ণয় প্রভৃতি নানা বিষয়ে সূক্ষ্মদৃষ্টি চাই। এই অভিজ্ঞতা কোনও শিক্ষকের কাছে বা শিক্ষালয়ে পাওয়া যায় না।

সকল শিল্প আর ব্যবসায়ের পথই এইরকম অল্পাধিক দুর্গম। পণ্য-উৎপাদক বা ব্যবসায়ী ঠিক কি প্রণালীতে কাজ করে এবং কোন্ উপায়ে প্রতিযোগিতা থেকে আত্মরক্ষা করে তা সাধারণকে জানতে দেয় না। সুতরাং কেবল বিজ্ঞান শিখলে বা technical education পেলেই ব্যবসা বুদ্ধি জন্মাবে না, শিল্পের প্রতিষ্ঠাও হবে না। চাকরি মিলতে পারে কিন্তু তার ক্ষেত্র সংকীর্ণ, কারণ দেশে প্রতিষ্ঠিত শিল্পের সংখ্যা অল্প। অতএব

শিক্ষা শেষ করেই অধিকাংশ যুবক স্বাধীন ব্যবসা আরম্ভ করতে পারবে এমন আশা নেই।

আমাদের দেশে যে কটি কৃষি বিদ্যালয় আছে তাতে কৃষক সন্তানের উপকার হ'তে পারে, কিন্তু ভদ্রসন্তান তাতে জীবিকার সন্ধান পায় না। সেখানে কেবল কৃষিবিদ্যাই শেখানো হয়, কৃষিজীবিকা নয়। যদি হাতে কলমে কাজ করিয়ে প্রমাণ করা হ'ত যে এত মূলধনে এত জমিতে অমুক অমুক ফসল চাষ করলে এত লাভ হয় তবেই শিক্ষা সার্থক হ'ত।

যাঁরা অনেক খরচ ক'রে ইউরোপ আমেরিকায় কৃষি বা শিল্প শিখতে যান তাঁরাও ফিরে এসে প্রায় চাকরির সন্ধান করেন। মূলধনের অভাবেই যে তাঁরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন না এমন নয়; প্রকৃত কারণ—তাঁরা বিদেশে যে শিক্ষা পান তা অতি সংকীর্ণ, কাজ আরম্ভের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। তাঁরা নিজের উপর নির্ভর করতে পারেন না, সাধারণেও তাঁদের টাকা দিতে ভরসা পায় না।

এই যে শিক্ষার ব্যর্থতা, এর ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্তও অনেক দেখা যায়। অনেক দৃঢ়সংকল্প ব্যক্তি কেবল পুঁথিগত বিজ্ঞান চর্চা ক'রে অথবা বিজ্ঞানের চর্চা না ক'রেও এবং বিশেষজ্ঞের সাহায্য না পেয়েও শিল্পপ্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য হয়েছেন, ক্ষুদ্র আরম্ভের বৃহৎ পরিণতি সাধন করেছেন। সাধারণ বিজ্ঞান এবং ফলিত বিজ্ঞানের শিক্ষার বিস্তার হ'লে এই প্রকার উদ্‌যোগী পুরুষদের সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। যাঁদের উৎসাহ আর সামর্থ আছে তাঁরা যদি কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞ হবার পর জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য বিদেশে ঘুরে আসেন তবে তাঁদের শক্তি অনেক বাড়বে তাতে সন্দেহ নেই।

এদেশের কয়েক মান্যগণ্য লোক বিদেশের বিশাল শিল্প ব্যবসায় দেখে অভিভূত হয়ে ফিরে এসেছেন। তাঁরা বলছেন—ছোট ছোট কারখানায় কিছু হবে না, কোটি কোটি টাকা দিয়ে শিল্পপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাঁদের এই কথা বড় শিল্প সম্বন্ধে সত্য, কিন্তু সকল ক্ষেত্রে সত্য

নয়। পাশ্চাত্ত্য দেশেও ছোট ও মাঝারি কারখানা আছে এবং এদেশের ছোট কারখানা কালক্রমে বড় হয়েছে এমন উদাহরণ অনেক আছে। অবশ্য আরম্ভের পূর্বে সতর্ক হ'তে হবে যে সংকল্পিত ব্যবসাটি অল্প মূলধনে অল্প আয়োজনে চালানো সম্ভবপর কিনা। কেউ যদি পঞ্চাশ হাজার বা লাখ টাকায় কাপড় বা কাগজের কল অথবা সোডা বা অ্যানিলিন রঙের কারখানা করতে যান তবে বিফল হবেন। কিন্তু যদি মোজা, গেঞ্জি বা বই বাঁধাই-এর কাপড় বা কার্বন পেপার বা কবজা ছিটকিনি বা দরজা জানলায় লাগাবার রঙের কারখানা করেন তবে সফল না হবার কারণ নেই। যাঁদের যথেষ্ট মূলধন যোগাড় করবার সামর্থ্য আছে তাঁরা বড় বড় শিল্পে মন দিতে পারেন, নিজের অভিজ্ঞতা না থাকলে বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ আনিয়ে কাজ আরম্ভ করতে পারেন; কিন্তু যাঁরা উদ্‌যোগ করবেন তাঁদের ব্যবসায় বুদ্ধি একান্ত আবশ্যক, নয়তো বিশেষজ্ঞকে চালাতে পারবেন না।

দেশ স্বাধীন হবার ফলে কতগুলি নূতন বৃত্তি সাধারণের লভ্য হয়েছে, যেমন সৈনিক নাবিক ও এয়ারোপ্লেন-চালক প্রভৃতির পদ। পূর্বে যে সমস্ত পদ ইওরোপীয়দের একচেটে ছিল তার সবগুলিই এখন দেশের লোকের অধিকারে এসেছে। কিন্তু এই সব নূতন বৃত্তির উদ্‌ভব এবং নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার ফলেও দেশের সকলের অন্নসংস্থান হবে না। অতএব উপার্জনের আরও আরও ব্যাপক ক্ষেত্র দেখতে হবে।

প্রতিনিধি (এজেন্ট), ব্যাপারী, আড়তদার, দালাল, পাইকার, দোকানী প্রভৃতি বহু মধ্যবর্তীর হাত ঘুরে পণ্যদ্রব্য ভোক্তার ঘরে আসে। মধ্যবর্তী বা middleman-এর কাজই বাণিজ্য, তাতে কিছুমাত্র অগৌরব নেই। এদের মধ্যে অনাবশ্যক অসাধু লাভগ্রাহী থাকতে পারে, কিন্তু মধ্যবর্তী ভিন্ন দেশের সর্বত্র পণ্য যোগান দেওয়া অসম্ভব। পণ্যের এই পরিক্রমা পথে অগণিত লোকের অন্নসংস্থান হয়। এই মহাজনসেবিত পথই জীবিকার রাজপথ। বাঙালী ভদ্রসন্তানের কর্তব্য এই পথের বার্তা সংগ্রহ করে

বণিকের বৃত্তিতে মন দেওয়া। যে সকল পরদেশী এদেশে কারবার করছে তাদের ছেলেরা ব্যবসায়ের পরিবেশের মধ্যেই মানুষ হয়, আত্মীয় স্বজনের কাছেই শিক্ষা পায়। বাঙালী ভদ্রলোকের গৃহে এই পরিবেশের অত্যন্ত অভাব। আমাদের ছেলেরা যেসব আত্মীয়ের সংস্রবে আসে তাঁদের বেশীর ভাগই কেরাণী, উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক, সাহিত্যিক প্রভৃতি। ছেলেরা এইসব বৃত্তির কিছু কিছু পরিচয় পায়, তা ছাড়া গল্প, উপন্যাস, ফুটবল, ক্রিকেট, রাজনীতি এবং সিনেমা নটনটীর খবর তো আছেই।

সম্প্রতি কিছু সুলক্ষণ দেখা যাচ্ছে, অনেক ভদ্রসন্তান সাহস ক'রে ব্যবসা আরম্ভ করেছেন, কৃতকার্যও হয়েছেন। আশা করা যায় তাঁদের দ্বারা বণিকবৃত্তির বীজ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়বে, আরও অনেকে তাঁদের পথে আসবেন। অভিভাবকদের কর্তব্য, সাধারণ শিক্ষার শেষে অথবা সঙ্গে সঙ্গে ছেলেকে কিছুকালের জন্য কোনও ব্যবসায়ীর কাছে সবেতনে বা অবেতনে কাজে নিযুক্ত রাখা। এই কাজের উদ্দেশ্য চাকরি নয়, ব্যবসা-শিক্ষা। পরীক্ষা পাশ করবার জন্য যেমন একাগ্র সাধনা করতে হয়, তেমনি ব্যবসায়ীর দোকানে, কারখানায়, আড়তে বা অফিসে চোখ কান উন্মুক্ত রেখে ভবিষ্যৎ জীবিকার তথ্য আত্মসাৎ করতে হবে। সকল দেশেই ব্যবসা শেখবার একমাত্র উপায় এই।*

---

* বঙ্গবাসী কলেজের হীরকজয়ন্তী উৎসবের সাংস্কৃতিক সম্মেলনের বিজ্ঞান বভাগে (১লা ডিসেম্বর, ১৯৪৮ সাল) প্রদত্ত বক্তৃতা।